যক্ষ্মা নির্মূলে সরকার বদ্ধপরিকর

মুহাম্মদ ফয়সুল আলম

জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০৩০ সালের মধ্যে একটি সুন্দর বিশ্বগড়ার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (SDGs) লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয়েছে। এসডিজি'র ১৭টি অভীষ্ঠের মধ্য ৩ নম্বরে আছে 'সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ' বাস্তবায়নে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) এবং ১৮(১) অনুসারে চিকিৎসাসহ জনগণের পুষ্টি উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। সাংবিধানিক এই দায়িত্ব পালন এবং স্বাধীনতার সুফল সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও সফল নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে সরকার দারুন প্রশংসিত হয়েছে। পেয়েছে আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার। স্বাস্থ্য অবকাঠামোখাতে তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম পর্যন্ত ব্যাপক বিস্তার করছে স্বাস্থ্য সেবা। সরকার ২০৩২ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমরা সবাই জানি যক্ষ্মা বাংলাদেশের জন্য একটি অন্যতম জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের যে ৩০টি দেশে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের মধ্যে বাংলাদেশে অন্যতম । ১৯৯৩ সালে পৃথিবীতে যক্ষ্মা রোগের প্রদুর্ভাব বেড়ে গেলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (who) যক্ষ্মাকে গ্লোবাল ইমার্জেন্সি ঘোষণা করে। তখন থেকে বাংলাদেশ সরকার বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে যক্ষ্মার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

২৪ মার্চ 'বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস' দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য '**Invest to End TB. Save Lives**.' যক্ষ্মা রোগের ক্ষতিকর দিক বিশেষ করে স্বাস্থ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং রোগটি নির্মূলে সারাবিশ্বে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। সুদীর্ঘকাল ধরে যক্ষ্মা বিশ্বব্যাপী অন্যতম প্রধান সংক্রামক রোগের স্থান দখল করে রেখেছে। এ রোগে বিশ্বে প্রতিবছর লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটে। বিশেষ করে দারিদ্র্য এবং ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোতে এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। ২০১৮ সালে সেপ্টেম্বর থেকে জাতিসংঘের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে যক্ষ্মা রোগ নির্মূলে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একমত হন। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সরকার, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন সংস্থা, স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে যক্ষ্মা রোগী খুঁজে সবাইকে চিকিৎসা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ৪০ মিলিয়ন মানুষকে যক্ষ্মার চিকিৎসা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে বর্তমানে কাজ করছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি যক্ষ্মার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে কার্যক্রম পরিচলনা করছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে যক্ষ্মা রোগ সনাক্তকরণ ও চিকিৎসা প্রদান করে আসছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য দেশে যক্ষ্মারোগী, মৃত্যু এবং সংক্রমণের হার এমন পর্যায়ে কমিয়ে আনা, যাতে যক্ষ্মা একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে বিবেচিত না হয়। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে ২০১৫ সালের পর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটি নতুন কৌশল অনুমোদন করে। যার আলোকে ২০৩৫ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে যক্ষ্মায় মৃত্যুহার ৯০ শতাংশ কমানো (২০১৫ সালের তুলনায়) এবং নতুনভাবে সংক্রমিত যক্ষ্মা রোগীর হার ৮০ শতাংশ (২০১৫ সালের তুলনায়) কমিয়ে আনা যায়।

টিবি বা যক্ষ্মা একটি মারাত্মক সংক্রামক ছোঁয়াচে রোগ। যা প্রধানত ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। যক্ষ্মা বলতে সাধারণভাবে আমরা ফুসফুসের যক্ষ্মাকেই বুঝি। এই রোগ Mycobacterium tuberculosis (MTB) এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ফুসফুসকে আক্রান্ত করে মানব শরীরে ছাড়ায়। তবে ফুসফুস ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন স্থানে যক্ষ্মা হতে পারে। যেমন- লসিকাগ্রন্থি, হাড় ও গিট, অন্ত্র, হৃদপিন্ডের আবরণ ও মস্তিষ্কের আবরণ, লিভারে এমনকি পাকস্থলিতেও হতে পারে।

যক্ষ্মা বা টিবি রোগের প্রধান লক্ষণগুলো হলো- সাধারণত তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাশি ও জ্বর; কাশির সঙ্গে কফ এবং রক্ত আসা; বুকব্যাথা অথবা শ্বাস নেয়ার সময় অথবা কাশির সময় ব্যথা হওয়া; ওজন কমে যাওয়া; শারীরিক দুর্বলতা ক্ষুধামান্দ্য খাদ্যে অরুচি, অবসাদ অনুভব করা ইত্যাদি। শরীরের যে অংশে যক্ষ্মার জীবাণু সংক্রমিত হবে সেই অংশটি ফুলে উঠবে। যেমন- গলার গ্লান্ড আক্রান্ত হলে গলা ফুলবে, মেরুদন্ড আক্রান্ত হলে পুরো মেরুদন্ড ফুলে উঠবে। ফোলার আকার বেশি হলে ব্যথাও হতে পারে। লিভারে যক্ষ্মা হলে পেটে পানি চলে আসে। তাই পেটও অস্বাভাবিক ফুলে যায়। মস্তিষ্কে সংক্রমিত হলে সেখানেও পানির মাত্রা বেড়ে যায়। এছাড়াও চামড়ায় বা অন্য যেখানেই হোক না কেন সেই অংশটা ফুলে ওঠে।

সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। দারিদ্র্য, অপুষ্টি, ঘনবসতি, অজ্ঞতা, অসচেতনতাসহ বিভিন্ন বিষয় এর সঙ্গে জড়িত। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের অনেকেই যক্ষ্মা রোগ শনাক্তের বাইরে থেকে যাচ্ছে। দেশে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বেশকিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। পুষ্টিহীনতা, বস্তি এলাকার ভাসমান এবং অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশে বসবাসকারী নগর ও মহানগরীর জনগোষ্ঠী যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সফলতাকে বাধাগ্রস্ত করছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ডায়াবেটিস, এইচআইভি আক্রান্ত রোগী, তামাক গ্রহণ, অবহেলা, অসচেতনতা । যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের প্রধান হাতিয়ার হলো ডটস্।

যক্ষ্মার জীবাণু বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। দেহে জীবাণু প্রবেশ করলেও সবাই আক্রান্ত হয় না। সংক্রমিত জনসংখ্যার ৫-১০ শতাংশ মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারণত ১৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের লোকেরা যক্ষ্মা রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। সারা বিশ্বের দশটি মৃত্যুজনিত কারণের মধ্যে যক্ষ্মা অন্যতম। আর বিশ্বের এক চতুর্থাংশ মানুষের দেহে এই রোগ সুপ্ত অবস্থায় আছে, যা সাধারণত সংক্রমণ ঘটায় না।যাদের এ রোগ রয়েছে তাদেরকে কিছু বিষয়ে সর্তক হতে হবে। হাঁচি বা কাশির সময় মুখে রুমাল দেওয়া, হাত দিয়ে মুখ ঢাকা অথবা এক দিকে সরে কাশি দিতে হবে। যেখানে সেখানে কফ বা থুতু ফেলা যাবে না। আক্রান্ত ব্যক্তির মুখের কাছাকাছি গিয়ে কথা বললে এ রোগের জীবাণু ছড়াতে পারে। রোগীর কফ বা থুতু নির্দিষ্ট পাত্রে ফেলে তা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

যক্ষ্মা শনাক্ত হওয়ার পর নিয়ম মেনে পূর্ণাঙ্গ ডোজ ঔষুধ সেবন করতে হয় যক্ষ্মা রোগীকে। কিন্তু কিছুদিন ঔষুধ সেবনের পর কিছুটা ভালো মনে হলেই ঔষধ বন্ধ করে দেন রোগীরা। অনেক রোগী পূর্ণাঙ্গ ডোজ আর শেষ করেন না। এতে করে ঐ রোগীর নরমাল যক্ষ্মা থেকে ঔষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মার আক্রান্তের আশঙ্কা দেখা দেয়। অর্থাৎ আগের নরমাল ঔষধগুলো ঐ রোগীর শরীরে আর কাজ করেনা । যার কারণে আরো দামি ঔষুধের পাশাপাশি উচ্চ দামের ইনজেকশন দিতে হয় ডিআর যক্ষ্মা রোগীকে।

যক্ষ্মাকে অভিশাপ মনে না করে এ রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হবে। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে সরকার কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা, নির্দেশিকা, প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি ও বিতরণ, ওষুধ, লজিস্টিক সাপোর্ট, তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ ও ভালো কাজের জন্য অংশীদারদের স্বীকৃতি প্রদান করে আসছে। এছাড়া বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো যক্ষ্মার নির্দেশিকা অনুযায়ী সেবা প্রদান, স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের পরিকল্পনা তৈরি, প্রশিক্ষণ প্রদান, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, বিনামূল্যে কফ পরীক্ষা, যক্ষ্মার ওষুধ প্রদান, নিয়মিত ও দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা নিশ্চিতকরণের কাজ করছে। ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসায় সাধারণত ২০-২৪ মাস পর্যন্ত চিকিৎসা নিতে হয়।

সরকার করোনা মহামারি শুরুর পর থেকে একদিনের জন্যও যক্ষ্মা শনাক্তকরণ ও রোগীর চিকিৎসা দেওয়া বন্ধ করেনি। যক্ষ্মা চিকিৎসায় নিরাময়ের হার গত ১০ বছরে ৯৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। গত এক বছরে উপসর্গ আছে এমন ২৭ লাখ লোকের পরীক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি ব্যবস্থাপনায় গত দশকে প্রায় ১০ লাখ মানুষকে সুস্থ্য করে তোলা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ের জন্য উন্নত ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করেছে যেমন- এলইডি মাইক্রোস্কোপ, জিন এক্সপার্ট মেশিন, লিকুইড কালচার ও লাইন প্রুপ অ্যাসে (লপিএ), ডিজিটাল এক্সরে ব্যবহার করছে। যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ে ইতোমধ্যে দেশে ৪৫৯টি জিনএক্সপাট মেসিন, ১১৩৬টি মাইক্রোস্কোপ ও ১২৬ ডিজিটাল এক্সরে চালু আছে। এ সকল সুযোগ বৃদ্ধি করায় দেশে ড্রাগ সেনসিটিভ ও ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট উভয় প্রকার যক্ষ্মার প্রায় ৮১% রোগী সনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও ১টি ন্যাশনাল রেফারেন্স ল্যাবরেটরি ও ০৪টি রিজিওনাল রেফারেন্স ল্যাবরেটরির যক্ষ্মা রোগ শনাক্ত করছে। পাশাপাশি ৪৪ টি বক্ষব্যাধি ক্লিনিক, ০৭টি বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতল, সদর হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অর্ন্তবিভাগ ও বর্হিবিভাগ, এবং এনজিও ক্লিনিকে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

শহরাঞ্চলের বস্তি এলাকায়, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী, গার্মেন্টসে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে, জেলখানা ও দুর্গম এলাকায় বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগী সনাক্তকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়কে বেগবান করার জন্য জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ব্র্যাকের সহায়তায় মোবাইল ভ্যানে স্থাপিত জিনএক্সপার্ট ও ডিজিটাল এক্সরে সাহায্যে নিয়মিত রোগ নির্ণয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি সূত্রে জানা গেছে, ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মার চিকিৎসা বাংলাদেশে সফলভাবে শুরু হয়েছে। এর ফলে চিকিৎসা ব্যয় এক-চতুর্থাংশে কমে এসেছে। ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মার চিকিৎসায় সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত নতুন ওষুধ বেডাকুইলিন ও ডেলামানিড ব্যবহার হচ্ছে। বছরে প্রায় ৩৫ হাজার শিশুকে ৬ মাস মেয়াদি টিবি প্রিভেন্টিভ থেরাপি দেওয়া হয়। শিশুদের পাশাপাশি বয়স্কদের যক্ষ্মা সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে একই সেবা দেওয়া শুরু হয়েছে। জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বিনামূল্যে রোগ শনাক্তকরণ ও ওষুধ সরবরাহ ছাড়াও দরিদ্র রোগীদের সাইকো কাউন্সিলিং ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০১৭ সাল থেকে যক্ষ্মা চিকিৎসার প্রথম সারির ওষুধ সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ক্রয় ও সরবরাহ করছে।

সরকারের একার পক্ষে যক্ষ্মা রোগ নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সামাজিক দায়িত্বের জায়গা থেকে সরকারের পাশাপাশি এনজিও, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজসহ সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণে কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে। সবার অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে পারলে যক্ষ্মা রোগ নিয়ন্ত্রণে সফলতা আসবে। এ জন্য শুধু যক্ষ্মা রোগ নিয়ন্ত্রণে নয়, সর্বক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি সবার অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

#

২০.০৩.২০২২ পিআইডি ফিচার